গৌরীপদ ভট্টাচার্য

বিদ্যাসাগর ও মানবতাবাদ

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে ইংরেজদের আগমন ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক বিচিত্র ব্যাপার। "য়ুরোপীয় চিত্তের জঙ্গম শক্তি আমাদের স্থাবর মনের উপর আঘাত করল।" ফলে আমরা স্বাধীনতা হারালাম, কিন্তু আধুনিকতার সংস্পর্শে আসলাম। আমাদের দুটোই চাই—আধুনিকতা চাই আবার স্বাধীনতাও চাই। তবেই দেশের উন্নতি। আগে গ্রহণ, পরে বর্জন। যেখান থেকে গ্রহণ করে আধুনিক হওয়া তাকেই বর্জন করার যে সংগ্রাম তাতে আধুনিকতা বজায় রাখা বিশেষ জরুরি। এই জরুরি কাজটি আমাদের দেশে ঠিকমতো পালিত হয়নি বলে মনে হয়।

আগে হল গ্রহণের পর্ব— পশ্চিম থেকে আধুনিকতা গ্রহণ। এই গ্রহণের কাজটিকেই বলি রেনেসাঁস। আধুনিকতার অর্থ কী? শাস্ত্রের উপর নির্ভর না করে নিজের বিচার বিবেচনার উপর নির্ভরতা, পরলোকের চিন্তা কমিয়ে এনে ইহলোকের সমস্যা নিয়ে ভাবনা চিন্তা, ইহজগতে নিজেদের চেষ্টায় সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার প্রয়াস—এই হল আধুনিকতা। এই আধুনিকতা রেনেসাঁসের সৃষ্টি। প্রাচীন ঐতিহাসিক Webster রেনেসাঁসের সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করে লিখেছেন : "It is a convenient term for all the changes in society, law and government, in sicence, philosophy and religion, in literature and art which gradually art which gradually transformed medieval civilization into that of modern times." রেনেসাঁসের মধ্য দিয়ে মোটামুটি পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে ইউরোপে যে নতুন জীবনবোধ গড়ে উঠে তাকে বলা হয় হিউম্যানিজম। হিউম্যানিজমের কেন্দ্রস্থলে আছে মানুষ—মানুষের স্বাধীনতা, তার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, তার বিকাশ। আঠারো শতকের শেষ দিক থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মাধ্যমে এই জীবনবোধের প্রভাব আমাদের দেশেও পড়তে থাকে—প্রথমে বঙ্গভূমিতে, পরে অন্যত্র।

রেনেসাঁস আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে অসাধারণ ব্যক্তিত্বপূর্ণ কিছু ব্যক্তিমানুষের উদ্ভব যেমন দেখা যায় তেমনি দেখা যায় তাঁদের নেতৃত্বে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরে পরিবর্তনের অবিশ্রান্ত প্রচেষ্টা। উনিশ শতকের বাংলা রেনেসাঁসে এইরকম অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন যে সব মানুষের উদয় হয় তাঁর মধ্যে রামমোহন রায় (১৭৭২-৭৪ থেকে ১৮৩৩) প্রথম। সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শুরু হয় পরিবর্তনের আন্দোলন—ধর্মের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মধর্মের উত্থান, সমাজ ক্ষেত্রে সতীদাহ প্রথা রোধ, শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজির প্রচলন, সাহিত্যের ক্ষেত্রে উন্নত বাংলা গদ্য ভাষার সূচনা এবং সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার উন্মেষ। বাংলার রেনেসাঁস আন্দোলনের দ্বিতীয় নেতা হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) রামমোহন বাংলার তথা ভারতের আধুনিকীকরণের যে কাজ শুরু করেন ঈশ্বরচন্দ্রের নেতৃত্বে মোটামুটি তারই সম্প্রসারণ ঘটে। "তিনি", চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিদ্যাসাগর বইতে লিখেছেন, "ব্রাহ্ম সমাজকে আন্তরিক ভালবাসিতেন। ভালবাসিতেন বলিয়াই যখনই প্রয়োজন হইয়াছে ব্রাহ্মসমাজের

স্বপক্ষতা করিয়াছেন ... ব্রাহ্ম সমাজের গণনায় ব্যক্তিগণের অনেকের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল।" রামতনু লাহিড়ী, রাজনারায়ণ বসু, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ ব্রাহ্ম নেতৃবৃন্দের সকলেই ছিলেন বিদ্যাসাগরের খুব ঘনিষ্ঠ। চণ্ডীচরণ লিখেছেন : "সকল বিষয়ে মতে না মিলিলেও স্বর্গীয় কেশব চন্দ্র সেন মহাশয়কে তিনি (বিদ্যাসাগর) অত্যন্ত সমাদর করতেন।"[১] ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও তিনি তাতে যোগ না দিয়ে হিন্দু সমাজকেই যথাসম্ভব উন্নত ও কুসংস্কারমুক্ত করে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। সমাজ, শিক্ষা ও সাহিত্য—এই তিন দিকে বিদ্যাসাগরের অবদান উল্লেখযোগ্য। তবে তাঁর অবদান অপেক্ষাও তাঁর মনুষ্যত্ব ছিল উজ্জ্বলতর। তিনি ছিলেন দয়ালু, দাতা ও জনহিতৈষী। দুঃস্থ, অভাবগ্রস্থ লোকদের সাহায্য করার ক্ষেত্রে মুক্তহস্ত। দুঃখের কারণ বিশ্লেষণ করার আগে তাঁর মধ্যে দুঃখমোচনের যে চেষ্টা দেখি তাতে মনে হয় তিনি প্রথমে দয়ার সাগর—তারপরে বিদ্যাসাগর। অন্যদিকে "রামমোহন সারা জীবন বুদ্ধি যুক্তি ও বিচারবোধের দ্বারাই চালিত হয়েছেন। হৃদয়ের আবেগ অনুভূতির প্রতি তিনি তেমন মূল্য দেননি।"[২] বিদ্যাসাগরের হৃদয়বত্তা তাঁর মননশীলতাকেও ছাড়িয়ে যায়।

বিদ্যাসাগরের জীবনকে আমরা তিনভাগে ভাগ করে দেখতে পারি। প্রথমত বাল্য ও ছাত্রজীবন (১৮২০-১৮৪১), দ্বিতীয়ত শিক্ষকতার জীবন ও শিক্ষাবিপ্লব (১৮৪২-১৮৭০), এবং তৃতীয়ত পদত্যাগ ও শিক্ষা বিস্তার (১৮৭১-১৮৯১) ১৮২০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর বীরসিংহ গ্রামে তাঁর জন্ম। পাঁচ বৎসর বয়স থেকে আট বৎসর বয়স পর্যন্ত বীরসিংহের পাঠশালাতে লেখাপড়া। তারপর কলকাতা এসে বড় বাজারে জগদ্দুর্লভ সিংহের বাড়িতে থেকে নিকটস্থ এক পাঠশালাতে ভর্তি। নয় বৎসর বয়সে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ। সেখানে অধ্যয়ন কালে ১৮৩৯ সালে হিন্দু-ল কমিটির পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেন। তখনকার দিনে জজ পণ্ডিত হতে গেলে এই পরীক্ষায় পাশ করা আবশ্যক ছিল। ১২ বৎসর পাঁচ মাস সংস্কৃত কলেজের বিভিন্ন শ্রেণীতে—ব্যাকরণ শ্রেণি, সাহিত্য শ্রেণি, অলঙ্কার শ্রেণি, বেদান্ত শ্রেণি, স্মৃতি শ্রেণি, ন্যায় শ্রেণি, জ্যোতিষ শ্রেণি, ইংরেজি শ্রেণি—অধ্যয়ন করে কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করে ১৮৪১ সালের ডিসেম্বরে ছাত্র জীবনের সমাপ্তি ঘটে। বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হওয়ার কিছু আগে ১৮২৭ সালে এখানে ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, যদিও কয়েক বৎসর পরেই ১৮৩৫ সালে কলেজ থেকে ইংরেজি শ্রেণি তুলে দেওয়া হয়। ছাত্র হিসেবে বিদ্যাসাগর খুবই মনোযোগী ছিলেন এবং ছাত্র জীবনের নানা পরীক্ষায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করার জন্য নানা পারিতোষিক ও বৃত্তি লাভ করেছিলেন। কলেজে প্রাথমিক স্তরের ইংরেজি শিক্ষা হয় এবং পরে ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষকের কাছে বিদ্যাসাগর ইংরেজিতে অসাধারণ বুৎপত্তি লাভ করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র যখন সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন (১৮২৯) তখন হিন্দু কলেজে ডিরোজিওর নেতৃত্বে (তিনি ১৮২৬ থেকে ১৮৩১-এর এপ্রিল পর্যন্ত হিন্দু কলেজে ছিলেন) ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন চলছে। তার দ্বারা ঈশ্বরচন্দ্র বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে মনে হয় না। হিন্দু সমাজে প্রচলিত সাধারণ প্রথার বিরুদ্ধে তাঁর কোনো বিদ্রোহ ছিল না। মাতৃবিয়োগের পরে কাশীপুরের গঙ্গাতীরে মাতৃশ্রাদ্ধ করে এক বৎসর স্বহস্তে রান্না করে একাহারে নিরামিষ খেয়ে দিন যাপন করেন। কিছু পরেই জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতা দেবীর স্বামী গোপালচন্দ্র সমাজপতি মারা

গেলে কন্যার সঙ্গে তিনি নিজেও মৎস্য ত্যাগ করে একাহার ও নিরামিষ খাওয়া শুরু করেন। কন্যা নিজেই পিতার নিরামিষ খাওয়া ও একাহার নিবারণে কৃতকার্য হন। হিন্দু সমাজের এই সব নিয়মকানুন বা দেশাচার তৎকালীন পণ্ডিতদের মতোই তিনি পালন করে চলতেন।

ছাত্রজীবনের পরেই তাঁর চাকুরি জীবন আরম্ভ। ১৮৪১ সালের একেবারে শেষ ভাগে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান পণ্ডিত হিসেবে যেগাদান করেন এবং প্রায় সতেরো বৎসর (১৮৫৮ সালের নভেম্বর পর্যন্ত) সরকারি শিক্ষা বিভাগেই—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও সংস্কৃত কলেজে—নিযুক্ত থাকেন। মাঝে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারির সঙ্গে বিরোধ হওয়ায় পদত্যাগ করেন (১৮৪৬-এর জুলাই), কিন্তু শীঘ্রই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে দ্বিতীয় বারের জন্য যোগ দিলেন। ১৮৫২ সালের জানুয়ারি থেকেই দ্বিতীয় বার সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করেন। ১৮৫৪ সালের মাঝামাঝি অধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করেন। ১৮৫৪ সালের মাঝামাঝি অধ্যক্ষ পদের সঙ্গে দক্ষিণ বঙ্গ স্কুল ইনস্পেক্টর হিসেবেও কাজ করতে হয় এবং ফলে অনেক স্কুল স্থাপন করার সুযোগ পান। নদিয়া, বর্ধমান, হুগলি ও মেদিনীপুর জেলায় বেশ কয়েকটি মডেল স্কুল স্থাপন করেন। ১৮৫৮ সালের নভেম্বরে সরকারের সঙ্গে মতের মিল না হওয়ায় পদত্যাগ করেন এবং প্রায় ৩৩ বৎসর পরে ১৮৯১ সালের ২৯ জুলাই কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়।

সংস্কৃত কলেজে প্রিন্সিপাল থাকার সময় বিধবাবিবাহ প্রচলন ও বহুবিবাহ রদ করার জন্য তিনি যে আন্দোলন শুরু করেন তার সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। এত বড়ো সমাজ আন্দোলন আমাদের দেশে আর ঘটেনি। বলা হয় যে রামমোহনের সতীদাহ বিরোধী আন্দোলনও এত বিরোধিতার সম্মুখীন হয়নি।

বিদ্যাসাগর শিক্ষক ছিলেন, কিন্তু কেবলমাত্র চাকুরি হিসেবে তিনি শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেননি। এটা ছিল দেশ সেবার মাধ্যম। দেশের উন্নতি সাধনের জন্য যে নেতৃত্বের প্রয়োজন তার প্রস্তুতি। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এমন একদল ছাত্র তৈরি করা যারা সারা বাংলাকে পথ দেখাতে পারবে। সরকারের শিক্ষা পরিষদ বা Council of Education-এর সেক্রেটারি মিঃ মাওয়াটের (Mouat) কাছে একটি চিঠিতে তিনি লেখেন : "কাউন্সিলের সমর্থন ও উৎসাহ যদি পাই তবে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে কয়েক বৎসরের মধ্যেই এমন একদল যুবক তৈরি করে দিতে পারব যারা তাদের শিক্ষা ও লেখার গুণে জনসাধারণের মধ্যে এমন শিক্ষা বিস্তারে সমর্থ হবে যা আপনাদের ইংরেজি বা দেশীয় কোনো কলেজের পক্ষেই সম্ভব হয়নি।" তবে বিদ্যাসাগর বলেন যে কলেজের কাজে তাঁকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে। "To enable me to carry out this great ... object of my wishes I must (excuse the strong word) to a considerable extent be left unfettered."[৩] তিনি বলেন যে তাঁর নিজস্ব মতামত অগ্রাহ্য করে অন্যের সব সুপারিশ গ্রহণ করতে যদি তাঁকে বাধ্য করা হয় তবে বুজতে হবে "my occupation is gone" অর্থাৎ তাঁর আশা পূর্ণ হবার নয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সংস্কৃত কলেজকে বিদ্যাসাগর যে ভাবে গঠন করেছিলেন তা পর্যবেক্ষণ করে সে বিষয়ে মতামত দেওয়ার জন্য বেনারস কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ ব্যালান্টাইনকে অনুরোধ করা হয়েছিল। তিনি এসে সব দেখেশুনে যে রিপোর্ট দেন তাতে বিদ্যাসাগরের প্রশংসা থাকলেও কিছু কিছু

বিষযে মন্তব্যও থাকে, এবং তিনি নতুন ব্যবস্থাও কিছু সুপারিশ করেন। বিদ্যাসাগর তার কিছুটা গ্রহণ করলেও সবটা গ্রহণে রাজি হন না।

ডঃ ব্যালান্টাইন বিশপ বার্কেলের (Berkeley) Inquiry বই কলেজে পড়াবার জন্য সুপারিশ করেছিলেন। বিশপ বার্কেলে একজন প্রথম শ্রেণির দার্শনিক, কিন্তু তাঁর দর্শন চিন্তা পুরোপুরি অধ্যাত্মবাদী—অনেকটা ভারতীয় বেদান্তের মতোই। তাই বিদ্যাসাগর সম্মত হলেন না। Mouat কে তিনি লিখলেন : "With regard to Bishop Berkeley's Inquiry I beg leave to remark that the introduction of it as a class book would beget more mischief than advantage."

তারপর তিনি লিখেছেন যে বাংলার সংস্কৃত কলেজে বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শন পড়াতেই হবে। তবে বেদান্ত, সাংখ্য এসব দর্শনশাস্ত্র যে ভুল (false) সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই। ভুল হলেও এ সব শাস্ত্রের উপর হিন্দুদের শ্রদ্ধা অপরিসীম। তাই বিদ্যাসাগর বলেন যে এসব শাস্ত্র পড়াবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভুল দেখিয়ে দেওয়ার জন্য পশ্চিমের দর্শনশাস্ত্রও পড়ানো উচিত। কিন্তু বিশপ বার্কেলে তাঁর Inquiry বইতে যে মতবাদ ব্যাখ্যা করেছেন তা সাংখ্য বেদান্তের মতোই। ইউরোপেও বার্কেলের মতবাদ এখন আর তেমন নির্ভরযোগ্য (not considered as a sound philosophy) বলে স্বীকৃত হয় না। তাই এই দর্শনচিন্তা দ্বারা বেদান্ত সাংখ্য দর্শনের অসারতা কোনো মতেই প্রমাণ করা সম্ভব হবে না। উপরন্তু বার্কেলে পড়ে ছাত্ররা মনে করবে যে ইউরোপের দর্শন চিন্তা ও সাংখ্যবেদান্তের মধ্যে মূলত কোনো পার্থক্যই নেই। ফলে "their revernce for these two systems (সাংখ্য ও বেদান্ত) "their reverence for these two systems " বিদ্যাসাগর মাওয়াটকে তাই জানিয়ে দিলেন যে এই কারণে বার্কেলের বই তিনি ছাত্রদের জন্য সুপারিশ করতে পারবেন না।

বিদ্যাসাগর বাংলাকে পাশ্চাত্য সভ্যতার পর্যায়ে উন্নীত করার চেষ্টা করেন। প্রাচ্য আধ্যাত্মিক ও পশ্চিম জড়বাদী—তাঁর কাছে এ সব কথার কোনো গুরুত্বই ছিল না। তিনি বলেন সত্য দউ রকম বা double হতে পারে না। প্রাচ্য দেশের জন্য ধর্ম আর পশ্চিমের জন্য ইহলোকের সুখ ভোগ এ রকম ভাগাভাগি কখনও সম্ভব নয়। "Truth is truth, if properly perceived." প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে truth আলাদা হবে, একজনের জন্য অধ্যাত্মবাদ এবং অপর জনের জন্য জড়বাদ, এ রকম হতে পারে না।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে প্রাচ্য অধ্যাত্মবাদী, এবং পাশ্চাত্য জড়বাদী, এ কথা স্বামী বিবেকানন্দ বিশেষ জোর দিয়ে প্রচার করেছেন। তিনিই আবার বলেছেন যে রামকৃষ্ণকে গুরু হিসেবে না পেলে তিনি বিদ্যাসাগরের শিষ্য হতেন। বিবেকানন্দ এ কথা বলেছেন বলে ভগিনী নিবেদিতা লিখে রেখে গেছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরকে অনুসরণ করলে স্বামী বিবেকানন্দ হওয়া সম্ভব হত না। রামকৃষ্ণ ও বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করেছিলেন, এবং তার বিস্তৃত বিবরণ শ্রীম তাঁর বিখ্যাত বইতে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। বিদ্যাসাগর কথা দিয়েও রামকৃষ্ণের আশ্রমে যাননি। তাঁদের পথ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু কথা দিয়েও না যাওয়ার ফলে রামকৃষ্ণ রুষ্ট হয়ে বলেন যে বিদ্যাসাগর মিথ্যে কথা বলে কেন? এই মিথ্যে কথা ভদ্রতার অপর নাম কিনা সে বিতর্কে যাওয়ার আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই।

যাঁরা বলেন যে হিন্দু শাস্ত্রের মধ্যেই বর্তমান ইউরোপীয় বিজ্ঞানের সমস্ত তথ্য নিহিত আছে বিদ্যাসাগর তাদের বক্তব্যকে মোটেই আমল দিতেন না। তিনি বলেন ভারতের প্রাচীনপন্থী পণ্ডিত সমাজ ইউরোপের বিজ্ঞান কখনও মেনে নেবে না। বহুদিনের কুসংস্কারে আবদ্ধ এই পণ্ডিতদের দৃষ্টিভঙ্গি অপরিবর্তিতই থাকবে। একগুঁয়ে ভাবে সমস্ত কুসংস্কার তারা মেনে চলবে। তাঁরা মনে করেন যে তাঁদের শাস্ত্র সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের মুখনিসৃত, এবং তাই অভ্রান্ত। এই পণ্ডিত সমাজের প্রতি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা বা সহানুভূতি ছিল না। তিনি বলেন যে আলোচনার সময় ইউরোপীয় বিজ্ঞানের নতুন কোনো তথ্যের কথা উল্লেখ করলে ভারতীয় পণ্ডিতেরা বিদ্রূপের হাসি হাসতে থাকেন। খলিফার নির্দেশে আলেকজেন্দ্রিয়া লাইব্রেরির মহা মূল্যবান গ্রন্থসমূহ ধ্বংস করে ফেলার কাহিনি উল্লেখ করে বিদ্যাসাগর বলেন যে ভারতীয় পণ্ডিতদের গোঁড়ামি তার চেয়ে কম নয়। বিদ্যাসাগর তাই লিখেছেন : "I regret to say that I cannot persuade myself to beleive that there is any hope of reconciling the learned of India to the reception of new scientific truths."[৬] এখানে learned বলতে ভারতের সনাতন পণ্ডিত সমাজকেই ধরা হয়েছে। বিদ্যাসাগর ছিলেন আধুনিক পণ্ডিত, এবং আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত একদল ছাত্রসমাজ তৈরি করে তাঁদের মাধ্যমে দেশকে আধুনিক করে গড়ে তোলা ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। শিক্ষাই ছিল পরিবর্তন সাধনের প্রধান অস্ত্র।

বিদ্যাসাগর বলেন যে এই প্রাচীনপন্থী পণ্ডিত সমাজকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেই যাওয়া উচিত। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের চেষ্টা করে লাভ নেই। তাঁদের বিরোধিতাকে ভয় করারও কোনো কারণ নেই। প্রাচীনপন্থীদের প্রভাব ক্রমশঃ কমে আসছে। আধুনিক শিক্ষার প্রভাব বাংলার যে প্রান্তেই প্রসারিত হচ্ছে সেখানেই এই পণ্ডিত সমাজ দুর্বল হয়ে আসছে। তাই প্রয়োজন হল এই পণ্ডিত সমাজকে অগ্রাহ্য করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শিক্ষার আলো নিয়ে যাওয়া, স্কুল স্থাপন করা, ছাত্রদের প্রয়োজন অনুযায়ী বই প্রকাশ করা এবং বিভিন্ন বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষক তৈরি করা। নতুন শিক্ষাপদ্ধতির ছাত্রদের নিজেদের ভাষার উপর পূর্ণ দখল থাকা চাই, প্রয়োজনীয় খবরাখবর যথেষ্ট পরিমাণে রাখা চাই, এবং দেশে প্রচলিত কুসংস্কার থেকে মুক্ত থাকা চাই—"free from the prejudice of their country." নিজের ছাত্রদের চিন্তাভাবনা লক্ষ্য করে বিদ্যাসাগর আশা প্রকাশ করেন যে "every qualified student will be found free from the prejudices of his country men." বিদ্যাসাগর Mouat কে জানিয়ে দেন, "এই রকম এক দল লোক গড়ে তোলাই আমার উদ্দেশ্য এবং সংস্কৃত কলেজের সমস্ত শক্তি সেই উদ্দেশ্য সফল করার জন্যই ব্যয়িত হবে।"[৭]

বিদ্যাসাগর মনে করতেন যে পাশ্চাত্য সভ্যতা ইউরোপের নিজস্ব সম্পদ নয় তা বিশ্বের। বাংলাকে সেই সভ্যতার স্পর্শে জাগিয়ে তোলাই ছিল তাঁর শিক্ষকতা জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য।

ইউরোপীয় সভ্যতা বলতে বিদ্যাসাগর শিল্প সভ্যতা বুঝতেন না। বুঝতেন রেনেসাঁস আমলের যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, কুসংস্কারমুক্ত আচরণ। ছাত্রদের মধ্যে এই দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলাই ছিল তাঁর আসল উদ্দেশ্য। সংস্কৃত কলেজের উন্নতিকল্পে বিদ্যাসাগর যে নোট তৈরি করেছিলেন (১৮৫২) তাতে বলেন যে আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক ধারণার সাথে হিন্দু দর্শনের বেশির ভাগই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় কিন্তু তবুও সে সব দর্শনশাস্ত্র জানতেই হবে। ইংরেজির মাধ্যমে ছাত্ররা

যাঁরা বলেন যে হিন্দু শাস্ত্রের মধ্যেই বর্তমান ইউরোপীয় বিজ্ঞানের সমস্ত তথ্য নিহিত আছে বিদ্যাসাগর তাদের বক্তব্যকে মোটেই আমল দিতেন না। তিনি বলেন ভারতের প্রাচীনপন্থী পণ্ডিত সমাজ ইউরোপের বিজ্ঞান কখনও মেনে নেবে না। বহুদিনের কুসংস্কারে আবদ্ধ এই পণ্ডিতদের দৃষ্টিভঙ্গি অপরিবর্তিতই থাকবে। একগুঁয়ে ভাবে সমস্ত কুসংস্কার তারা মেনে চলবে। তাঁরা মনে করেন যে তাঁদের শাস্ত্র সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের মুখনিসৃত, এবং তাই অভ্রান্ত। এই পণ্ডিত সমাজের প্রতি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা বা সহানুভূতি ছিল না। তিনি বলেন যে আলোচনার সময় ইউরোপীয় বিজ্ঞানের নতুন কোনো তথ্যের কথা উল্লেখ করলে ভারতীয় পণ্ডিতেরা বিদ্রুপের হাসি হাসতে থাকেন। খলিফার নির্দেশে আলেকজেন্দ্রিয়া লাইব্রেরির মহা মূল্যবান গ্রন্থসমূহ ধ্বংস করে ফেলার কাহিনি উল্লেখ করে বিদ্যাসাগর বলেন যে ভারতীয় পণ্ডিতদের গোঁড়ামি তার চেয়ে কম নয়। বিদ্যাসাগর তাই লিখেছেন : "I regret to say that I cannot persuade myself to beleive that there is any hope of reconciling the learned of India to the reception of new scientific truths."[৬] এখানে learned বলতে ভারতের সনাতন পণ্ডিত সমাজকেই ধরা হয়েছে। বিদ্যাসাগর ছিলেন আধুনিক পণ্ডিত, এবং আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত একদল ছাত্রসমাজ তৈরি করে তাঁদের মাধ্যমে দেশকে আধুনিক করে গড়ে তোলা ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। শিক্ষাই ছিল পরিবর্তন সাধনের প্রধান অস্ত্র।

বিদ্যাসাগর বলেন যে এই প্রাচীনপন্থী পণ্ডিত সমাজকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেই যাওয়া উচিত। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের চেষ্টা করে লাভ নেই। তাঁদের বিরোধিতাকে ভয় করারও কোনো কারণ নেই। প্রাচীনপন্থীদের প্রভাব ক্রমশঃ কমে আসছে। আধুনিক শিক্ষার প্রভাব বাংলার যে প্রান্তেই প্রসারিত হচ্ছে সেখানেই এই পণ্ডিত সমাজ দুর্বল হয়ে আসছে। তাই প্রয়োজন হল এই পণ্ডিত সমাজকে অগ্রাহ্য করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শিক্ষার আলো নিয়ে যাওয়া, স্কুল স্থাপন করা, ছাত্রদের প্রয়োজন অনুযায়ী বই প্রকাশ করা এবং বিভিন্ন বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষক তৈরি করা। নতুন শিক্ষাপদ্ধতির ছাত্রদের নিজেদের ভাষার উপর পূর্ণ দখল থাকা চাই, প্রয়োজনীয় খবরাখবর যথেষ্ট পরিমাণে রাখা চাই, এবং দেশে প্রচলিত কুসংস্কার থেকে মুক্ত থাকা চাই—"free from the prejudice of their country." নিজের ছাত্রদের চিন্তাভাবনা লক্ষ্য করে বিদ্যাসাগর আশা প্রকাশ করেন যে "every qualified student will be found free from the prejudices of his country men." বিদ্যাসাগর Mouat কে জানিয়ে দেন, "এই রকম এক দল লোক গড়ে তোলাই আমার উদ্দেশ্য এবং সংস্কৃত কলেজের সমস্ত শক্তি সেই উদ্দেশ্য সফল করার জন্যই ব্যয়িত হবে।"[৭]

বিদ্যাসাগর মনে করতেন যে পাশ্চাত্য সভ্যতা ইউরোপের নিজস্ব সম্পদ নয় তা বিশ্বের। বাংলাকে সেই সভ্যতার স্পর্শে জাগিয়ে তোলাই ছিল তাঁর শিক্ষকতা জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য।

ইউরোপীয় সভ্যতা বলতে বিদ্যাসাগর শিল্প সভ্যতা বুঝতেন না। বুঝতেন রেনেসাঁস আমলের যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, কুসংস্কারমুক্ত আচরণ। ছাত্রদের মধ্যে এই দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলাই ছিল তাঁর আসল উদ্দেশ্য। সংস্কৃত কলেজের উন্নতিকল্পে বিদ্যাসাগর যে নোট তৈরি করেছিলেন (১৮৫২) তাতে বলেন যে আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক ধারণার সাথে হিন্দু দর্শনের বেশির ভাগই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় কিন্তু তবুও সে সব দর্শনশাস্ত্র জানতেই হবে। ইংরেজির মাধ্যমে ছাত্ররা

বিদ্যাসাগরের পরে আমাদের রাজ্যের সমাজ ক্ষেত্রে বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের বা বহুবিবাহ রদের মতো গণ আন্দোলন আর কখনও ঘটেনি। দেশের নজর চলে যায় রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার দিকে। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর ৬ বৎসর আগে তৈরি হয় ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। তারও আগে বাংলায় গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন যেমন ল্যান্ডহোল্ডার্স সোসাইটি (১৮৩৭), বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি (১৮৪৩), ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন (১৮৫১), ন্যাশনাল স্যোসাইটি বা জাতীয় সভা (১৮৭০), ইন্ডিয়ান লীগ (১৮৭৫), স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন (১৮৭৫), ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন (১৮৭৬) ইত্যাদি। তা ছাড়া রাজনারায়ণ বসুর নেতৃত্বে জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা, জাতীয় মেলা বা হিন্দু মেলা ইত্যাদি। ব্রাহ্মসমাজ ও ইয়ং বেঙ্গলের অনেকে রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন।

বিদ্যাসাগরের পূর্বসূরি যদি কেউ থাকেন তবে নিঃসন্দেহে তিনি রাজা রামমোহন রায়, যদিও রাজার ধর্মপথ ধরে তিনি সংস্কার কাজে ব্রতী হননি। ধর্ম সম্বন্ধে তিনি ছিলেন বুদ্ধদেবের মতোই মৌন। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : "তিনি (বিদ্যাসাগর) নিজে আমাদের নিকট বলিয়াছেন যে ... এ দুনিয়ার একজন মালিক আছেন তা বেশ বুঝি, তবে ঐ পথে না চলিয়া এ পথে চলিলে নিশ্চয় তাঁহার প্রিয়পাত্র হইব, স্বর্গরাজ্য অধিকার করিব, এ সকল বুঝিও না, আর লোককে তাহা বুঝাইবার চেষ্টাও করিও না।" তারপরেই বিদ্যাসাগর বলেন : "নিজে যেমন বুঝি সেই পথে চলিতে চেষ্টা করি, পীড়াপীড়ি দেখিলে বলিব 'এর বেশি বুঝিতে পারি নাই।'"[৯] ছেলেদের জন্য 'বোধোদয়' নামে যে পাঠ্যপুস্তক বিদ্যাসাগর রচনা করেছিলেন সেখানে প্রথম সংস্করণে ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনো কথা ছিল না। কিন্তু পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কথায় পরবর্তী সংস্করণে ঈশ্বর সম্বন্ধে একটি নোট যুক্ত করা হয়। এই ঘটনা থেকে চণ্ডীচরণের সিদ্ধান্ত হল যে "নিজ ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধ হইলে তাঁহার মতো শিক্ষার সুহৃদ বালকগণের পাঠ্যপুস্তকে ঈশ্বর-বোধক পাঠ সন্নিবিষ্ট করিতেন না।"[১০] তৃতীয়তঃ চণ্ডীচরণের যুক্তি হল যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিত রচনার জন্য তাঁর লেখা যে সব চিঠিপত্র জোগাড় করা হয়েছে তার প্রত্যেকটিতে 'শ্রী হরিঃ শরণম্" লিখিত আছে, এবং তা থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে বিদ্যাসাগর যেহেতু "কেবল মাত্র লোকাচারের বশবর্তী হইয়া কোনো কাজই করিতেন না", অতএব হরিতে বিদ্যাসাগরের নিশ্চয়ই বিশ্বাস ছিল।

এ সব যুক্তি দেখিয়ে চণ্ডীচরণ সিদ্ধান্ত করেন যে বিদ্যাসাগর ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ কথাও লিখেছেন যে "সূক্ষ্মতর রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে গেলে তাঁহার নিত্য জীবনের আচার ব্যবহার ক্রিয়াকলাপসম্পন্ন আস্থাবান হিন্দুর অনুরূপ ছিল না, অপর দিকে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মের লক্ষণের পরিচয়ও কখনও পাওয়া যায় নাই।"[১০] আস্থাবান হিন্দু বা নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মের মতো ধর্ম যদি না হয় তবে সেটা কী রকম ধর্ম? চিঠিপত্রে "শ্রীহরিঃ শরণম" লেখাকে সমাজে প্রচলিত প্রথার অনুকরণ বলে ধরে নেওয়াই সঙ্গত মনে হয়। সামাজিক প্রথা তো তিনি অনেক কিছুই মেনে চলতেন। সকলকেই মেনে চলতে হয়। মাতা ও জামাতার মৃত্যুর পর তাঁর একাহার ও নিরামিষ খাওয়ার কথা তো আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। যে দেশাচার ক্ষতিকারক, এবং মানুষের দুঃখের কারণ তার বিরুদ্ধে ছিল বিদ্যাসাগরের জেহাদ। 'বোধোদয়' পাঠ্যপুস্তকে লৌহ, সীমা, কাচ, স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি বিভিন্ন বস্তুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া আছে। তাদের সঙ্গে

ঈশ্বর একেবারেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। হয়ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সঙ্গে বন্ধুত্বের জন্যই এটা পরে যোগ করা হয়েছে। লৌহ, সিসা, কাচের মতো বস্তু মানা না মানার কোনো প্রশ্ন উঠে না, কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে সে প্রশ্ন স্বাভাবিক। ঈশ্বর সম্বন্ধে সেখানে লেখা আছে যে ঈশ্বর সমস্ত পদার্থের সৃষ্টিকর্তা, নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ, পরম দয়ালু, সর্বত্র বিদ্যমান কিন্তু তাঁকে কেউ দেখতে পায় না। এটা হল ঈশ্বর সম্বন্ধে মানুষের সাধারণ ধারণা। সেখান থেকে ঈশ্বরচন্দ্রের ভগবানবিশ্বাসের সিদ্ধান্ত করা কোনোভাবেই সঙ্গত নয়। প্রথম সংস্করণে ঈশ্বর সম্বন্ধে নোট না থাকাটাই বেশি অর্থবহ। তাই চণ্ডীচরণের যে সব যুক্তি তা থেকে আমাদের সমস্যার চূড়ান্ত কোনো মীমাংসা সম্ভব নয়।

গোপাল হালদার অন্য দিকে মনে করেন যে বিদ্যাসাগরকে "মেটিরিয়লিস্ট না বললেও 'রিয়লিস্ট' বলে মানতেই হয়।"[১১] তিনি বলেন যে বিদ্যাসাগর দেব মন্দিরে যেতেন না, সাধুসন্ন্যাসীর কাছে ঘেঁষতেন না, পূজা-আর্চ জপ-তপ কেউ তাঁকে কখনও দেখে নি, মন্দির, মসজিদ, ব্রাহ্ম-উপাসনা এ সব সকল বিষয়েই তিনি নিস্পৃহ। তা ছাড়া তাঁর লেখা যত পুস্তক—কথামালা, নীতিবোধ, চরিতাবলী, জীবনচরিত, আখ্যানমঞ্জরী, বাঙ্গালার ইতিহাস প্রভৃতি—কোথাও ভগবান ও ধর্মীয় অধ্যাত্মবাদের কোনো কথাই নেই। 'বোধোদয়' বইতে যেখানে পদার্থ, চেতন পদার্থ, মানবজাতি, চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি সম্বন্ধে (আগেই বলা হয়েছে যে এ সবের সাথে ঈশ্বরও যুক্ত রয়েছে) সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া আছে তার বিজ্ঞাপনে লেখা আছে যে এ সব পাঠে "অমূলক কল্পিত গল্পের পাঠ অপেক্ষা অধিকতর উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা।"[১২] কথামালাতে বাঘ, বক, দাঁড়কাক, শৃগাল এসব নিয়ে লেখা, নীতিবোধে পরিবারের প্রতি ব্যবহার, বিনয় এ সব নিয়ে চরিতাবলীতে প্রধানতঃ ইউরোপের বিভিন্ন মানুষ সম্বন্ধে, জীবনচরিতে কোপর্নিকস, গালিলিয় প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের সম্বন্ধে, আখ্যানমঞ্জরীতে মাতৃভক্তি, গুরুভক্তি (গুরু এখানে শিক্ষক) ধর্মভীরুতা (ধর্ম এখানে নৈতিকতা), আতিথেয়তা ইত্যাদি নামে ছোটো ছোটো গল্প সন্নিবেশিত হয়েছে। ভগবান বা সাধুসন্ন্যাসীদের অলৌকিক কাহিনি কিছুই নেই। প্রচলিত ধর্মে বা কোনোরকম অপার্থিব আধ্যাত্মিক শক্তিতে বিশ্বাস যদি থাকত তবে এ সব রচনায় তা প্রকাশ পেত না কি? বালক বালিকাদেরকেই ধর্ম শিক্ষা দেওয়া হয়। ধর্ম বিশ্বাস যার আছে সে এরকম নীরব থাকে না। তাই তাঁকে নাস্তিক বা অজ্ঞেয়বাদী বলেই মনে হয়। ব্রাহ্মসমাজে যোগ না দেওয়া হয়ত এটাই প্রধান কারণ।

গোপাল হালদার মহাশয় বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ বই-এর তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকার শেষ দিকে এই প্রশ্নের আলোচনা করে লিখেছেন যে বিদ্যাসাগরের মতে "জ্ঞান বিজ্ঞানের পথে এগিয়ে চলাই মানুষের ধর্ম, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে ও মানবিক প্রেমে-মমতায় কর্তব্যপালনই মানবধর্ম; সে পথে ঈশ্বর সম্বন্ধে যদি জ্ঞান হয়, হোক—কিন্তু আপাতত তার হেতু নেই।" অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের মতে বিজ্ঞানের পথই জ্ঞানের পথ, এবং মানুষকে ভালবাসাই মানব কর্তব্য—সেই পথে এখন পর্যন্ত ঈশ্বরকে পাওয়া যায়নি। পরে আরও স্পষ্ট করে লিখেছেন : "এ দেশে ধর্ম বলতে যা বোঝায়, এবং ধার্মিক লোকেরা ঈশ্বর বলতে যা বোঝেন—বিদ্যাসাগর তাতে আস্থা রাখতেন না। তাঁর বিশ্বাস ছিল মানবিক ধর্মে।" ব্যাখ্যা করে লিখেছেন : "বিদ্যাসাগরের সমস্ত জীবনের মধ্য দিয়ে আমরা এই মানবধর্মেরই স্বীকৃতি দেখতে পাই—'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' আর এ 'মানুষ' চণ্ডীদাসের আধ্যাত্মিক মানুষ নন, আধুনিক সভ্যতার

সামাজিক মানুষ।" তাই বিদ্যাসাগরকে গোপাল হালদার একজন 'হিউম্যানিস্ট' বলে বর্ণনা করেছেন—কেবল একজন 'ইনটেলেকচুয়াল হিউম্যানিস্ট নন, আসলে একজন 'হিউমেন হিউম্যানিস্ট', যিনি "অন্তরের প্রেম করুণা দিয়ে বুঝেছেন মানুষই সত্য।" এই অভিমতই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।

বিদ্যাসাগর ছিলেন গ্রামের এক সাধারণ ছেলে। পরিবারে পথ দেখাবার মতো তেমন কেউ ছিল না। তাঁর পক্ষে এত বড়ো বৈপ্লবিক কাজ করা কীভাবে সম্ভব হল সেটাই আশ্চর্যের বিষয়। রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, "সে চরিত্রের ছাঁচ ছিল ভালো। ঈশ্বরচন্দ্রের পূর্বপুরুষের মধ্যে মহত্ত্বের উপকরণ প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত ছিল।"[১৭] আচার্য রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীও লিখেছেন : "পিতা পিতামহ হইতে তাঁহার ধাতুতে মজ্জাতে ও শোণিতে এমন একটা পদার্থ তিনি পাইয়াছিলেন, যাহাতে সমুদায় বিপত্তি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া তিনি বীরের মতো সেই রণক্ষেত্রে দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।"[১৮] ঈশ্বরচন্দ্রের নিজস্ব গুণাবলি নিঃসন্দেহে অসাধারণ। অন্তর্নিহিত শক্তিটাই মনে হয় আসল উপাদান। সঙ্গে সঙ্গে তখনকার দিনের বাংলার সাংস্কৃতিক পরিবেশও উল্লেখযোগ্য। বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র তখন হিন্দু কলেজে চলছিল ইয়ং বেঙ্গলের প্রচণ্ড ঝড়। প্রকৃতির ঝড়ের মতোই সেটা ছিল ক্ষণস্থায়ী। বিদ্যাসাগরকে তা প্রভাবিত করতে পারেনি। হিন্দু সমাজের প্রচলিত প্রথা বা দেশাচার যার যুক্তি নেই কিন্তু ক্ষতিও করে না তাদের প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রের কোনো অনীহা ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্রের সময় বাংলায় রামমোহনের প্রভাব সংগঠিত হয় তত্ত্ববোধিনী সভায়। *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৮৪৩ সালে। বিদ্যাসাগর তখন প্রথমবারের জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে। অক্ষয় কুমার দত্ত ছিলেন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক। তত্ত্ববোধিনী সভায় বাল্যবিবাহ, বহু বিবাহ, বিধবা বিবাহ এ সব নিয়ে আলোচনা হত, এবং এ সব বিষয়ে পত্রিকায় প্রবন্ধও প্রকাশিত হত। অক্ষয় দত্ত ছিলেন বিদ্যাসাগরের খুব ঘনিষ্ঠ, এবং 'বিধবা বিবাহ উচিত কি না—বিদ্যাসাগরের লেখা এই প্রবন্ধ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়। তখনকার সমাজে বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সংখ্যাও কম ছিল না। অক্ষয় কুমার দত্ত, রামতনু লাহিড়ী, রাজনারায়ণ বসু, প্যারীচরণ সরকার, কালীচরণ ঘোষ, কালীকৃষ্ণ মিত্র, দ্বারকানাথ মিত্র, নারায়ণ বসু, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ—এঁরা সকলেই ছিলেন বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তা ছাড়া সুরেন্দ্রনাথের পিতা দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এ রকম অনেকের সহায়তাই তিনি পেয়েছিলেন।

হিন্দু পুনরুত্থানবাদ তখনও তেমন করে জেগে উঠেনি। রামকৃষ্ণ ঈশ্বরচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন, এবং ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে তিনি দেখাও করেছিলেন। নিজের আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেনকে মুগ্ধ করতে পারলেও রামকৃষ্ণ ঈশ্বরচন্দ্রকে বিন্দুমাত্রও প্রভাবিত করতে পারেন নি। বিবেকানন্দের (১৮৬৩-১৯০২) যুগ তখনও শুরু হয় নি।

তাই ঈশ্বরচন্দ্র আইনের মাধ্যমে সমাজপরিবর্তনের চেষ্টা করলেও তখনকার দিনের শিক্ষিত জনমত সেই পরিবর্তনের পক্ষেই ছিল। জনমত অগ্রাহ্য করে জোর করে রাষ্ট্রের মাধ্যমে তিনি সমাজ পরিবর্তনের চেষ্টা করেননি। তবে 'মেজরিটি' তাঁর পক্ষে ছিল তা বলা যায় না নিশ্চয়ই।

বহুবিবাহ বন্ধ করার জন্যও তিনি আন্দোলন শুরু করেন। কিন্তু সিপাহি বিদ্রোহের জন্য আইন পাস সম্ভব হয় না। এটা রটে গিয়েছিল যে বিধবা বিবাহের পক্ষে আইন প্রবর্তনের জন্যই

এই বিদ্রোহের উৎপত্তি। যাই হোক ইংরাজ সরকার সতর্ক হয়ে উঠে। হিন্দু সমাজজীবনে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত হয়। শেষ পর্যন্ত স্বাধীন ভারত আইনের মাধ্যমে এই প্রথার অবসান ঘটায়।

বিদ্যাসাগর সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টায় বিশেষ করে বিধবা বিবাহ প্রচলনের চেষ্টায় সাফল্য লাভ করেছেন কি? চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সর্বপ্রধান কীর্তি বিধবা বিবাহ প্রচলন চেষ্টা সম্যক সুসিদ্ধ হয় নাই।"[১৯] রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীও মন্তব্য করেন : "ঈশ্বরচন্দ্রের বীরত্ব বিধবার দুঃখ মোচনে সমর্থ হয় নাই। দেশাচারের জয়লাভ ঘটিয়াছে সত্য কথা; কিন্তু ইহাই প্রকৃতির নির্বন্ধ। স্বাভাবিক, সরল, ছদ্মবেশহীন মনুষ্যত্ব ইহাতে ম্রিয়মাণ হইবে, সন্দেহ নাই; কিন্তু দুঃখ প্রকাশ নিষ্ফল; কেন না ইহা বিধিলিপি।"[২০] আধুনিক কালের একজন ঐতিহাসিকের মতে "The widow remarriage movement scored a legal and moral triumph but as a practical and widespread social reform it failed."[২১] গোপাল হালদার বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকাতে (আটাশ পাতা) লিখেছেন : "বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কারের প্রয়াস তাই তখন কার্যক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছিল। বহুবিবাহ বন্ধ করবার আইনই পাস করানো গেল না, বিধবা বিবাহ বিধিবদ্ধ হলেও বাঙ্গালী সমাজ যেন জেদ করেই তা অচল করে রাখতে চাইল।"

এই ব্যর্থতার কারণ কী? উত্তর মোটামুটি বিদ্যাসাগরই দিয়ে গেছেন। তিনি বলেন : "আমি আশা করিয়াছিলাম কোনো সামাজিক ক্রিয়াকে শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিলেই এ দেশের লোক তাহা অবনত মস্তকে গ্রহণ করিবে, কিন্তু আমার সে বিশ্বাস বিনষ্ট হইয়াছে। এ দেশে শাস্ত্র এবং দেশাচার এক পথে না চলিয়া পরস্পর বিভিন্ন পথে চলিয়াছে।"[২২] অর্থাৎ সাধারণ মানুষ শাস্ত্র মেনে চলে না, দেশাচার মেনে চলে। মনে রাখা দরকার দেশাচার সবই সমান ভাবে বর্জনীয় এমন কোনো কথা নেই। সব সমাজেই দেশাচার প্রচলিত আছে। অনেক দেশাচার আছে যার কোনো যুক্তি নেই, কিন্তু কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ক্ষতিকারক নয়। চিঠির উপরে শ্রী হরি শরণং লেখাও ছিল একসময় দেশাচার বা লোকাচারের অঙ্গ ছিল। দেশাচার যদি ক্ষতিকারক বলে বোধ হয় তবে তা অবশ্যই বর্জনীয়। সেই সব দেশাচার পরিবর্তনের উপায় কী?

প্রধান উপায় অবশ্যই শিক্ষা—শিক্ষার সঙ্গে আন্দোলন ও আইনের ভূমিকাও জড়িত। এমন শিক্ষা যা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করে, অর্থাৎ যুক্তিসম্মত জীবনদর্শন গড়ে তোলে। সাধারণভাবে শিক্ষিত মানুষের মধ্যেও দেশাচার—তা ক্ষতিকারক হলেও—রক্ষা করে চলার প্রবণতা যথেষ্ট প্রবল থাকে। বিদ্যাসাগরের সময় ভূদেব মুখোপাধ্যায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন বাল্যবিবাহের সমর্থক। তিনি লিখেছেন : যাঁহারা বাল্যবিবাহ প্রণালীর কেবল দোষমাত্র দেকেন, ইহার গুণ দেখিতে পান না, তাঁহাদিগকে ইংরাজদিগের নিরবচ্ছিন্ন অনুচিকীর্ষু বলিলে অন্যায্য গালি দেওয়া হয় না।"[২৩] তাঁর মতে "বাল্যবিবাহ যে বয়োধিক বিবাহ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় থাকে না," কারণ "বয়োধিকদিগের মন পাকিয়া যায়, অভ্যাস স্থির হইয়া দাঁড়ায়, চরিত্র নির্দিষ্ট পথ অবলম্বন করে, তাহারা কি আর তেমন পরস্পরে মিলিয়া একতাসম্পন্ন হইতে পারে?"[২৪] তাই

এমন শিক্ষা চাই যা মানুষের গতানুগতিক ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত করে যুক্তিবাদী মনোভাব গড়ে তুলতে পারে। অর্থাৎ রেনেসাঁস আন্দোলন চাই। বিদ্যাসাগর শিক্ষাপদ্ধতিকে সে ভাবেই গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। এমন একদল ছাত্র গড়ে তোলা যারা তাদের দেশে প্রচলিত সমস্ত কুসংস্কার (prejudices) থেকে মুক্ত থাকবে।

বহুবিবাহ নিয়ে বঙ্কিম-বিদ্যাসাগর বিতর্ক উল্লেখ করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বহু বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে ঈশ্বরচন্দ্রের আন্দোলনকে পরিহাস করে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন "বহুবিবাহ রূপ রাক্ষসবধের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় মহারথীকে ধৃতাস্ত্র দেখিয়া অনেকেরই ডনকুইক্সোটকে মনে পড়িবে।"[২৫] বঙ্কিম বহুবিবাহ প্রথার পক্ষে ছিলেন না; এই প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগর যে আন্দোলন তিনি ছিলেন তার বিরুদ্ধে। কারণ কী? তিনি মনে করতেন যে এই প্রথার বিরুদ্ধে জনমত ইতিমধ্যেই গড়ে উঠেছে। তাই তাকে আবার গড়ে তোলার আয়োজন পণ্ডশ্রম মাত্র। তাই বিদ্যাসাগরের এই আন্দোলনকে ডন কুইক্সোটের কাজ বলেই তাঁর মনে হয়েছে। তিনি লিখেছেন : "যাঁহারা স্বয়ং বহুবিবাহ করিয়া থাকেন তাহাদিগেরই মুখে বহুবিবাহ প্রথার ভূয়সী নিন্দা এবং কৌলীন্যের উপর ধিক্কার আমরা শতবার শুনিয়াছি। তবে যে তাঁহারা কেন এত বিবাহ করেন, সে স্বতন্ত্র কথা।"[২৬] বিদ্যাসাগরের কাছে এটা 'স্বতন্ত্র' কথা ছিল না—এটাই ছিল আসল কথা! মুখে নিন্দা করলেও বাস্তবে যদি বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকে তবে তার বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রয়োজন নাই কি? বঙ্কিম লিখেছেন : "এমত চোর কেহই নাই যে জিজ্ঞাসা করিলে চুরিকে অসৎকর্ম বলিয়া স্বীকার করিবে না—কিন্তু অসৎকর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিয়াও সে আবার চুরি করে। কুলীনেরাও বহুবিবাহ নিন্দনীয় বলিয়া স্বীকার করিয়াও বহুবিবাহ করেন।"[২৭] তা হলে চুরি বিরুদ্ধে আইনের প্রয়োজন যদি থাকে তবে বহুবিবাহের বিরুদ্ধেও নিশ্চয়ই আইনের প্রয়োজন ছিল। আইন করতে গেলে তার পক্ষে জনমত গঠন করা এবং আন্দোলন করার নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। জনমত স্পষ্টভাবে গঠিত না হলে ব্রিটিশ সরকার হিন্দু সমাজে প্রচলিত দুর্নীতির বিরুদ্ধে কখনও কোনো আইন প্রণয়নে রাজী হবে না। তাই এই প্রথাকে নির্মূল করতে গেলে আন্দোলনের প্রয়োজন নিশ্চয়ই ছিল।

বঙ্কিম বলেন যে বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে দেশে যে জনমত গড়ে উঠেছে তা এ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের পুস্তক প্রচারের ফলে হয়নি। এই জনমত, বঙ্কিমের মতে, "দেশের মধ্যে সুশিক্ষা প্রচার বা ইউরোপীয় নীতির প্রচার বা সাধারণ উন্নতির ফল।" বহুবিবাহ দেশে যতটা প্রবল বলে বিদ্যাসাগর প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছেন বঙ্কিমের মতে তা "ততটা প্রবল নহে।"[২৮]

হুগলি জেলায় বহুবিবাহপরায়ণ যে সব ব্রাহ্মণ আছেন সে সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর তাঁর প্রথম পুস্তকে যে তালিকা প্রকাশ করেছিলেন সে সম্বন্ধে বঙ্কিম বলেন : "অনেকের মুখে শুনিয়াছি যে তালিকাটি প্রমাদশূন্য নহে। কেহ কেহ বলেন যে মৃত ব্যক্তির নাম সন্নিবেশ দ্বারা তালিকাটি স্ফীত হইয়াছে। আমরা স্বয়ং যে দুই একটির কথা সবিশেষ জানি তাহা তালিকার সঙ্গে মিলে নাই।" আসলে তালিকাটি একেবারে প্রমাদশূণ্য কিনা সেটা তেমন জরুরি নয়; এই প্রথা যে বর্তমান আছে সেটাই জরুরি। হুগলি জেলায় বহু বিবাহ করেছেন এমন ১৩৩ জনের নাম বিদ্যাসাগর তাঁর তালিকায় উল্লেখ করেছিলেন। চতুর্থবার পর্যন্ত যারা বিবাহ করেছেন তাদের নাম বাদ দিয়ে এই তালিকা তৈরি হয়েছিল, এবং একটি জেলার বহু বিবাহপরায়ণ ব্রাহ্মণের

সংখ্যা দিয়ে সমস্ত দেশের অবস্থা সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা গড়ে তোলা সম্ভব হতে পারে তা মনে করেই বিদ্যাসাগর এই তালিকা প্রস্তুত করেন। তবে এই তালিকা যে একেবারে সঠিক বিদ্যাসাগরও তা দাবী করেন নি। তিনি লিখেছেন যে যারা অধিকসংখ্যক বিবাহ করেছেন তারা নিজেরাই নিজেদের বিবাহের প্রকৃত সংখ্যা সঠিকভাবে বলতে পারেন না। অন্যের মাধ্যমে তা জানতে হয়েছে, এবং বিদ্যাসাগর বলছেন, ''অন্যের তাহা অবধারিত জানিতে পারা সহজ নহে।''[২৯] তালিকায় যে সংখ্যা তিনি দিয়েছেন তা যে একেবারে নির্ভুল তাও তিনি দাবি করেননি। ''অন্যের তাহা অবধারিত জানিতে পারা সহজ নহে'' লিখেই তিনি লিখছেন : ''বিবাহের যে সকল সংখ্যা নির্দিষ্ট হইয়াছে, যদি কোনও স্থলে প্রকৃত সংখ্যা তদপেক্ষা অধিক হয়, তাহাতে কোনও কথা নেই; যদি ন্যূন হয়, তাহা হইলে কুলীনপক্ষপাতি আপত্তিকারীরা মহাশয়েরা অনায়াসে বলিবেন, আমি ইচ্ছাপূর্বক সংখ্যাবৃদ্ধি করিয়া নির্দেশ করিয়াছি, কিন্তু আমি সেরূপ করি নাই; অনুসন্ধান দ্বারা যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহাই নির্দেশ করিয়াছি; জ্ঞানপূর্বক কোনও বৈলক্ষণ্য করি নাই।'' তাই তালিকাটি প্রমাদশূন্য কিনা তার চেয়ে বেশি জরুরি ছিল বহুবিবাহ প্রথার প্রচলন আছে কিনা।

বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন যে বহুবিবাহ প্রথা অনেক হ্রাস পেয়েছে এবং কোনো প্রচেষ্টা ছাড়াই এই প্রথা যতটুকু অবশিষ্ট আছে তাও লুপ্ত হবে। তিনি লিখছেন : ''এই বাংলায় এক কোটি আশী লক্ষ হিন্দু বাস করে, ইহার মধ্যে আঠার শত জন ব্যক্তিও যে অধিবেদনপরায়ণ নহে, ইহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে; অর্থাৎ দশ সহস্র হিন্দুর মধ্যে একজনও অধিবেদনপরায়ণ কিনা সন্দেহ। এই অল্পসংখ্যকদিগের সংখ্যাও যে দিন দিন কমিতেছে, স্বতঃই কমিতেছে, তাহাও সকলে জানেন।''[৩০] বঙ্কিম মনে করেন যে কোনো উদ্যোগ বা প্রচেষ্টা ছাড়া স্বাভাবিকভাবেই এই প্রথার অবসান ঘটবে। তাঁর ভাষায়, ''কাহারও কোনো উদ্যোগ করিতে হইতেছে না—কোনো রাজব্যবস্থার আবশ্যক হইতেছে না—কোনো পণ্ডিতের ব্যবস্থার আবশ্যক হইতেছে না, আপনা হইতেই কমিতেছে। ইহা দেখিয়া অনেকেই ভরসা করেন যে, এই কুপ্রথার যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহা আপনা হইতেই কমিবে।''

বঙ্কিমের এই আশাবাদী মনোভাবে বিদ্যাসাগরের কোনো বিশ্বাস ছিল না। তিনি লিখেছেন : ''কুলীনদিগের বিবাহ বিষয়ক অত্যাচারের প্রায় নিবৃত্তি হইয়াছে, যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, অল্পদিনেই তাহার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হইবেক, একথা সম্পূর্ণ অলীক।'' তিনি বলেন যে কলকাতার অবস্থা দেখে সাড়া বাংলার অবস্থা যারা অনুমান করেন তাঁরা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। ''কলিকাতাবাসী নব্য সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক পল্লীগ্রামের কোনও সংবাদ রাখেন না; সুতরাং তত্রত্য যাবতীয় বিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; কিন্তু তৎসংক্রান্ত কোনও বিষয়ে অভিপ্রায় প্রকাশের প্রয়োজন হইলে, সম্পূর্ণ অভিজ্ঞের ন্যায়, অসঙ্কুচিত চিত্তে তাহা করিয়া থাকেন। তাঁহারা, কলিকাতার ভাবভঙ্গী দেখিয়া, তদনুসারে পল্লীগ্রামের অবস্থা অনুমান করিয়া লয়েন। ঐ সকল মহোদয়েরা বলেন, এ দেশে বিদ্যার সবিশেষ চর্চা হওয়াতে, বহুবিবাহাদি কুপ্রথার প্রায় নিবৃত্তি হইয়াছে।''[৩১] বিদ্যাসাগর স্বীকার করেন যে ইংরেজি বিদ্যার অনুশীলন এবং ইংরেজ জাতির সংসর্গের ফলে কলকাতা ও তার সন্নিহিত স্থানে কুপ্রথা ও কুসংস্কার অনেক হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু অন্যান্য অঞ্চল সম্বন্ধে তা একেবারেই ঠিক নয়। তিনি মনে করেন যে, ''পল্লীগ্রামের অবস্থা কোনও অংশে

কলিকাতার মত হইয়াছে, এরূপ নির্দেশ নিতান্ত অসঙ্গত।" তাই তিনি বলেন, "বহুবিবাহ প্রথা বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান করিলে, ঐ জঘন্য ও নৃশংস প্রথার অনেক নিবৃত্তি হইয়াছে, উহা আর পূর্বের মতো প্রবল নাই, পরপ্রতারণা যাঁহার উদ্দেশ্য নহে, তাদৃশ ব্যক্তি কদাচ এরূপ নির্দেশ করিতে পারেন না।"

বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন যে শাস্ত্রের উপর নির্ভর করে সমাজ সংস্কার সম্ভব নয়, কারণ শাস্ত্রের মধ্যে পরস্পর বিরোধী মত ব্যক্ত করা আছে। বহু বিবাহের বিরুদ্ধে শাস্ত্রের বচন যেমন আছে বহু বিবাহের পক্ষেও শাস্ত্রের বচন খুঁজে পাওয়া যাবে। তাই শাস্ত্রের উপর নির্ভর করে সমাজ আন্দোলন সম্ভব নয়। তিনি বলেন : "যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ, সেই কারণেই বহুবিবাহ হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিলে, একটি দোষ ঘটে"। সেই "দোষ"টি হল যে শাস্ত্রে বহুবিবাহের পক্ষেও অনেক কথা আছে। তাই বঙ্কিমচন্দ্র বলেন : "এরূপ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কি ফল। এ শাস্ত্রানুসারে লোককে কার্য করিতে বলিলে বহু বিবাহ নিবারণ হয় না বৃদ্ধি হয়?"[৩২]

কিন্তু শাস্ত্রে আছে বলেই বহুবিবাহ প্রথা রহিত হওয়া উচিত বিদ্যাসাগরের ইচ্ছা যে সে রকম ছিল না, বঙ্কিমচন্দ্রও তা স্বীকার করেন। বিদ্যাসাগর এবং তাঁর সঙ্গে যাঁরা একমতাবলম্বী তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বহু বিবাহ নিবারণের জন্য আইন প্রণয়ন করা হউক। আইন বা রাজবিধি প্রণয়নে যাতে কোনো অসুবিধা না হয় সেই উদ্দেশ্যেই বিদ্যাসাগর বহু বিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণের চেষ্টা করেন। "নচেৎ", বঙ্কিমচন্দ্র লিখছেন, "শাস্ত্রের নামে ভয় পাইয়া হিন্দু বহুবিবাহ বা কোনো চির প্রচলিত প্রথা হইতে নিবৃত্ত হইবেক, এমত ভরসা বিদ্যাসাগর মহাশয় করিবেন, বোধ হয় না। কিন্তু রাজব্যবস্থার পক্ষে প্রবৃত্তিদায়ক বলিয়াও এ বিষয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রের সাহায্য অবলম্বন করা আমাদিগের উপযুক্ত বোধ হয় না। এ বিষয়ে রাজবিধি প্রণীত করিতে গেলে, তাহা কি শাস্ত্রানুমত হওয়া আবশ্যক? না শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও ক্ষতি নাই? ... যদি তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও চলে, তবে বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাওয়া নিষ্প্রয়োজনে পরিশ্রম করা মাত্র।" পাশ্চাত্য দর্শনে অনুপ্রাণিত বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রের প্রতি তেমন কোনো ভক্তি ছিল না, কিন্তু কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষ যাতে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আইন গ্রহণ করতে রাজি হয় সেই জন্যই শাস্ত্রের সমর্থন খোঁজা। শাস্ত্রের অনুমোদন যদি না থাকে তবে ইংরাজ সরকারও হিন্দুদের সমাজ জীবনে কোনো হস্তক্ষেপে সম্মত হবে না।

বহুবিবাহ প্রথা বিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের "আর একটি কথা" হল যে "এদেশে অর্দ্ধেক হিন্দু, অর্দ্ধেক মুসলমান। যদি বহুবিবাহ নিবারণ জন্য আইন হওয়া উচিত হয় তবে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্বন্ধেই সে আইন হওয়া উচিত। হিন্দুর পক্ষে বহুবিবাহ মন্দ, মুসলমানের পক্ষে ভাল, এমত নহে। কিন্তু বহুবিবাহ হিন্দুশাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়া মুসলমানের পক্ষেও তাহা কি প্রকারে দণ্ডবিধির দ্বারা নিষিদ্ধ হইবে?"[৩৩] কিন্তু বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা পুস্তকে বিদ্যাসাগর স্পষ্টই লিখেছিলেন : "এ দেশের মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকে বহু বিবাহ করিয়া থাকেন; তাঁহারা চিরকাল সেরূপ করুন; তাহাতে আবেদনকারীদের কোনও আপত্তি নাই, এবং তাঁহাদের এরূপ ইচ্ছাও নহে।"[৩৪] উনবিংশ শতাব্দী বাংলার রেনেসাঁস হিন্দু সমাজের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। পরে জাতীয়তাবাদ এসে হিন্দুমুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টায় বিফল হয়ে দেশ বিভাগের কাজ সম্পন্ন করে।

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন জাতীয়তাবাদের জনক আর বিদ্যাসাগর রেনেসাঁস আন্দোলনের প্রাণপুরুষ শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, হিন্দু সমাজের নারী জাগরণে এবং বাংলা ভাষার উন্নতিসধানে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়। ইউরোপীয় সভ্যতার উজ্জ্বল বর্তিকা হাতে নিয়ে তাঁর সংগ্রাম ছিল মধ্যযুগীয় অন্ধকারের বিরুদ্ধে।

বিদ্যাসাগরের উত্তরসূরি যদি কেউ থাকেন তবে মনে হয় তিনি হলেন মানবেন্দ্রনাথ রায়। দুই জনই যুক্তিবাদী হিউম্যানিস্ট এবং ধর্মীয় মনোভাবের উর্ধে। দুইজনই মনে করেন শিক্ষাই প্রগতির প্রধান পথ। সাধারণ শিক্ষা নয়—এমন শিক্ষা যা মানুষকে প্রচলিত কুসংস্কার বা সব রকম prejudice থেকে মুক্তি রাখবে। দুইজনই জাতীয়তাবাদের বিরোধী। দুইজনই চেষ্টা করেছেন এমন এক দল ছাত্র/কর্মী তৈরি করতে যারা নিঃস্বার্থ ভাবে সমাজ উন্নয়নের কাজে আত্মনিয়োগ করে যাবে। মানবেন্দ্রনাথের রেনেসাঁস ইনস্টিটিউট যেমন, তেমনি ভাবে সংস্কৃত কলেজকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। দুইজনই ছিলেন জাতীয়তাবাদের বিরোধী। দুইজনের একজনও নিজেদের কোনো সংগঠন তৈরি করে যাননি।

বিনয় ঘোষের উদ্ধৃতি দিয়ে গোপাল হালদার লিখেছেন যে বিদ্যাসাগর কেবল একজন 'ইনটেকচুয়াল হিউম্যানিস্ট' ছিলেন না—তিনি ছিলেন একজন হিউমেন হিউম্যানিস্ট। সঠিক মূল্যায়ন। হিউম্যানিস্ট বা মানবতাবাদী আমরা কাকে বলি? মানুষকে যিনি, জাতি, সম্প্রদায় বা শ্রেণির মতো কোনো গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা না করে একজন স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করেন তিনিই হলেন হিউম্যানিস্ট। হিউম্যানিস্ট বা মানবতাবাদী চিন্তা প্রধানতঃ দুরকমের—ধর্মীয় মানবতাবাদ এবং ইহলৌকিক মানবতাবাদ—ইংরেজিতে বলা হয় theocentric humanism এবং anthropocentric humanism. Jacques Maritain তাঁর বিখ্যাত *True Humanism* এ লিখেছেন : "We are thus led to distinguish between two kinds of humanism : a humanism which is theocentric or truly Christian, and one which is anthropocentric, for which the spirit of the Renaissance and that of the Reformation were primarily responsible." তারপরেই তিনি লিখেছেন : "The first kind of humanism recognises that the centre for man is God," এবং "the second kind of humanism believes that man is his own centre, and, therefore, the centre of all things." ভারতের যে মানবতাবাদী চিন্তা সম্বন্ধে আমরা বিশেষভাবে পরিচিত—উপনিষদীয় মানবতাবাদ, বৈষ্ণবীয় মানবতাবাদ, মধ্যযুগের কবীর, নানক, দাদু, চৈতন্যের মানবতাবাদ এবং আধুনিক যুগের রামকৃষ্ণ, গান্ধি, রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদ—সবই হল ধর্মীয় বা theocentric বা পার্থিব মানবতাবাদ প্রচার করেন, এবং প্রচারের চেয়েও বেশি বাস্তবে মেনে চলেন।

উল্লেখপঞ্জি :

১। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিদ্যাসাগর*, কলকাতা, পৃ: ৪৫৭-৮।

২। অজিত কুমার ঘোষ, সম্পাদক, রামমোহন রচনাবলী ১৯৭৩ : হরফ : কলকাতা : ভূমিকা

৩। বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ, বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, ১৯৭২, কলকাতা, প্রথম খণ্ড, পৃ: ৪৫৮।

৪। ঐ, পৃ: ৪৫৩।

৫। ঐ।

৬। ঐ, পৃ: ৪৫৫।

৭। ঐ, পৃ: ৪৫৬।

৮। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ২৮৭।

৯। ঐ, পৃ: ৪৬৫-৬৬।

১০। ঐ, পৃ: ৪৬৩।

১১। বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ, তৃতীয় খণ্ড, ভূমিকা, পৃ: ৩৬।

১২। বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ: ১৭৫।

১৩। রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিম বঙ্গ সরকার, ১৩৬৮, পৃ: ৩৩৩।

১৪। আচার্য রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, *চরিত কথা*, সপ্তম সংস্করণ, কলকাতা, পৃ: ৭।

১৫। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ২৫৮।

১৬। রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, চরিত কথা, পৃ: ১৮-১৯।

১৭। N. S. Bose, *The Indian Awakening and Bengal*, Calcutta, p. 139.

১৮। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ২৫৮।

১৯। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, পারিবারিক প্রবন্ধ, কলকাতা, পৃ: ১।

২০। ঐ, পৃ: ৩।

২১। বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ১৪১১ বাংলা : বিবিধ প্রবন্ধ : বহুবিবাহ, পৃ: ২৭৩।

২২। ঐ, পৃ: ২৭২।

২৩। ঐ।

২৪। ঐ, পৃ: ২৭৩।

২৫। বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ২০৬।

২৬। বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ২৭৩।

২৭। বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ২০৯।

২৮। বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, বিবিধ প্রবন্ধ, পৃ: ২৭৫।

২৯। ঐ।

৩০। বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ২১৭।

৩১। Jacques Maritain, *True Humanism*, London, p. 19.